

মুখতাসার যাদুল মা'আদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অনুচ্ছেদ সমূহের সূচী ও বিবরণ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহঃ)

হুদায়বিয়ার ঘটনায় যে সমস্ত ফিকহী মাসায়েল জানা যায়

- হুদায়বিয়ার ঘটনায় দলীল পাওয়া যায় যে, হজ্জের মাস সমূহেও উমরাহ করা জায়েয। হজ্জের ন্যায় উমরাহের ক্ষেত্রেও মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা উত্তম। আর যেই হাদীছে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিস হতে উমরার ইহরাম বাঁধবে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, তা সঠিক নয়।
- এতে আরও দলীল পাওয়া যায় যে, উমরাতে কোরবানীর জানোয়ার সাথে নেয়া সুন্নাত। কোরবানীর জন্ততে দাগ লাগানোও সুন্নাত; এটি মুছলা বা অঙ্গহানীর শামিল হবে না।
- আল্লাহর দুশমনদের মধ্যে ক্রোধের জ্বালা প্রবেশ করানো জায়েয।
- সেনাপতির উচ্চ শত্রুদের দেশে গোয়েন্দা প্রেরণ করা।
- প্রয়োজন বশত যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রাপ্ত ও চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের সহায়তা নেওয়া জায়েয। কেননা উয়াইনা আল-খুজায়ী কাফের হওয়া সত্ত্বেও নাবী (ﷺ) তার সাহায্য নিয়েছিলেন।
- সেনাপতির উচ্চ সঠিক মতামত খুঁজে বের করার জন্য সাধারণ সৈনিক ও জনগণের সাথে পরামর্শ করা। এতে আল্লাহর আদেশ পালিত হবে এবং তাদের মনও খুশী হবে।
- যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই মুশরিকদের শিশু সন্তানদেরকে বন্দী করা জায়েয আছে।
- অন্যায় কথার প্রতিবাদ করা জরুরী। যদিও সেই কথাটি অবুঝ মানুষ কিংবা কোন পশুকে লক্ষ্য করে বলা হয়। কেননা হুদায়বিয়ার দিন রসূল (ﷺ) এর উটনী কাসওয়া যখন বসে পড়ল, তখন লোকেরা বলল যে, রসূল (ﷺ) এর উটনী কাসওয়ার অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। রসূল (ﷺ) তাদের কথার প্রতিবাদ করে বললেন- কাসওয়ার অভ্যাস খারাপ হয়নি। পূর্বেও তার অভ্যাস খারাপ ছিল না। বরং একে সেই আল্লাহ তা'আলাই রুখে দিয়েছেন, যিনি আবরারাহর হসিঅবাহিনীকে রুখে দিয়েছিলেন।[1]
- দ্বীনি বিষয়কে জোরালোভাবে উপস্থাপন করার জন্য শপথ করা জায়েয আছে। নাবী (ﷺ) থেকে আশিটিরও অধিক স্থানে শপথ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের তিনটি স্থানে তথা সূরা সাবা, সূরা ইউনুস এবং সূরা তাগাবুনে সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য শপথ করার আদেশ দিয়েছেন।
- মুশরিক এবং পাপী লোকেরাও যদি আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতি আহবান জানায়, তাহলে আল্লাহর নিদর্শনের সম্মান রক্ষার্থে তাদের সাথে সহযোগিতা করা জায়েয আছে। তবে তাদের ফাসেকী ও কুফরীর সাথে কোন প্রকার সহযোগিতা করা যাবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়ের উপর সাহায্য চায়, তার ডাকে সাড়া দিতে হবে। সাহায্যপ্রার্থী যে কেউ হোক না কেন। তবে শর্ত হল সেই প্রিয় বস্তুর কারণে সাহায্য করতে গেলে যাতে সেই প্রিয় বিষয়টির চেয়ে অধিক ভয়াবহ কোন ক্ষতি সাধিত না হয়। মানুষের নিকট এটি একটি কঠিন ও সুক্ষ্ম বিষয়। এ কারণেই হুদায়বিয়ার

দিন কতিপয় সাহাবীর হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। উমার (রাঃ) তো সেই দিন উমরাহ না করেই হৃদয়বিয়া থেকে ফেরত আসাতে অসম্ভব প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সেই দিন রসূল (ﷺ) এর ন্যায় জবাব প্রদান করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, আবু বকর (রাঃ) সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম, সর্বাধিক জ্ঞানী এবং আল্লাহ রসূল ও আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। তিনি রসূল (ﷺ) এর অনুসরণেও ছিলেন সর্বাধিক মজবুত। এই জন্যই উমার (রাঃ) নাবী (ﷺ) এবং আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীকে কোন বিষয়েই জিজ্ঞেস করতেন না।

- এতে আরও জানা গেল যে, নাবী (ﷺ) হৃদয়বিয়ার ডান দিক থেকে বের হয়েছিলেন। তাই ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন- হৃদয়বিয়ার এক অংশ হারামের সীমানার মধ্যে এবং অন্য অংশ এর বাইরে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন- নাবী (ﷺ) হারামের সীমানায় সলাত আদায় করতেন এবং হারামের সীমার বাইরে অবস্থান করতেন। এতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হারামের সীমানার মধ্যে এবং এর যেকোন স্থানে সলাত পড়লেই বাড়তি ছাওয়া (এক ওয়াক্তের বিনিময়ে এক লক্ষ ওয়াক্তের ছাওয়া) পাওয়া যাবে। নাবী (ﷺ) এর বাণী-

صَلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ

“মসজিদুল হারামের এক সলাত অন্যান্য মসজিদের এক লাখ সলাত থেকেও উত্তম”। [2] এখানে শুধু মসজিদকে খাস করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলার বাণীর তাৎপর্যও অনুরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَلَا يَفْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

“সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে”। (সূরা তাওবা-৯: ২৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

- “পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি”। (সূরা ইসরা-১৭:১)
- যে ব্যক্তি মক্কার নিকটবর্তী কোন স্থানে অবতরণ করবে, তার উচিত হবে হারামের সীমানার বাইরে অবস্থান করা এবং সলাতের সময় হলে হারামের সীমানার মধ্যে সলাত আদায় করা। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এরূপই করতেন।
- মুসলমানদের স্বার্থে ইমাম নিজেই শত্রুদের সাথে সন্ধির প্রস্তাব করতে পারেন।
- হৃদয়বিয়ার সন্ধি চলাকালে মুগীরা বিন শুবা রসূল (ﷺ) এর মাথার কাছে তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অথচ তিনি অন্য সময় এমন করতেন না। এতে জানা গেল যে, মুসলিম শাসকের কাছে অমুসলিমদের দূত আসলে মুসলমানদের শান-শাওকাত ও শাসকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জায়েয আছে। এটি কোন দোষের বিষয় নয়। এমনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে গর্ব ও বীরত্ব প্রকাশ করা কোন দোষের বিষয় নয়।

- শত্রুর সামনে উটসমূহ হাজির করার মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যায় অমুসলিম শাসকদের দূতের সামনে ইসলামের নিদর্শনসমূহ পেশ করা মুস্তাহাব। সেই দিন মুগীরাকে নাবী (ﷺ) বলেছিলেন- তোমার ইসলাম কবুল করাকে মেনে নিলাম। আর তুমি যে মাল নিয়ে এসেছ, এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের সম্পদের উপরও হস্তক্ষেপ করা যাবেনা এবং তার মালিকও হওয়া যাবেনা; বরং তা মালিকের নিকট ফেরত দেয়া হবে। মুগিরা বিন শুবা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের সাথে বসবাস করত। অতঃপর সে তাদের সাথে গাদ্দারী করে তাদের সম্পদ হস্তগত করে নিয়েছিল। তাই নাবী (ﷺ) সেই মালের প্রতি কোন প্রকার দৃষ্টিপাত করেননি, সম্পদগুলো স্বীয় মালিকের জন্য রক্ষা করা কিংবা এর কোন দায়-দায়িত্বও নেন নি। কেননা এটি ছিল মুগিরা বিন শুবা (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ঘটনা।
- সেই দিন আবু বকর (রাঃ) উরওয়া বিন মাসউদকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- তুমি যাও এবং লাভ-এর লজ্জাস্থান চাটতে থাকো! এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রয়োজনে লজ্জাস্থানের নাম উল্লেখ করা জায়েয আছে। এমনি যে ব্যক্তি জাহেলীয়াতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তার জন্য এ কথা বলতে বলা হয়েছে যে, তোমার বাপের লজ্জাস্থান চুশতে থাকো। এ সমস্ত কথা ইংগিতের মাধ্যমে বলা হবেনা; বরং খোলাখুলি বলা হবে। কেননা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে বক্তব্যও ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় এ ধরনের কথা বলা দোষণীয়।
- বহিরসূত লোক কিংবা কাফেরদের দূতরা বেআদবী করলে বিশেষ স্বার্থে তাতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কেননা হুদায়বিয়ার দিন উরওয়া যখন রসূল (ﷺ) এর দাড়িতে বারবার হাত লাগাচ্ছিল, তখন তাকে বাঁধা দেয়া হয়নি।
- লোকেরা হুদায়বিয়ার দিন রসূল (ﷺ) এর কফ, থুথু এবং ব্যবহৃত পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল এবং বুক ও চেহারায় মাখাচ্ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে উপরের বস্তুগুলো অপবিত্র নয়।
- হুদায়বিয়ার ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নেকফাল (শুভ লক্ষণ) লওয়া অর্থাৎ ভাল কিছু দেখে বা শুনে ভাল কিছু কামনা করা মুস্তাহাব। হুদায়বিয়ার দিন যখন কুরাইশদের দূত সুহাইল আগমণ করল তখন নাবী (ﷺ) বললেন- তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেছে। সুহাইল অর্থ নরম ও সহজ।
- হুদায়বিয়ার সন্ধিতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থ অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে মুশরিকদের সাথে চুক্তি করা জায়েয আছে।
- সময় নির্ধারণ না করে কেউ যদি কোন কাজ করার শপথ করে, কিংবা নযর মানে বা কোন ওয়াদা করে তবে তা তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন করা জরুরী নয়। বিলম্বে পূর্ণ করলেও চলবে।
- মাথা কামানো হাজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত এবং চুল ছোট করার চেয়ে কামানো উত্তম। হাজ্জ বা উমরার সফরে বাধাপ্রাপ্ত হলেও মাথা কামানো বা মাথার চুল ছোট করা একটি ইবাদত। অন্যের পক্ষ হতে উমরাহ করলেও বদলী উমরাহকারীর মাথা মুন্ডন করা বা মাথার চুল খাটো করা আবশ্যিক।
- হাজ্জ বা উমরাহ সম্পাদনের ইচ্ছায় সফররত ব্যক্তি যেই স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেখানেই কোরবানীর জন্তু যবেহ করবে। চাই সে জায়গা হারামের বাইরে হোক বা ভিতরে- এতে কোন পার্থক্য নেই। এটা আবশ্যিক নয় যে, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হারামে পৌঁছতে সক্ষম না হলে অন্য কারও মাধ্যমে হারামে কোরবানীর জানোয়ার পাঠিয়ে দিবে। যাতে হারামের সীমানায় যবেহ করা যায়। এটিও জরুরী নয় যে,

কোরবানীর জন্তু হারামে পৌঁছার পূর্বে ঐ ব্যক্তি হালাল হতে পারবেনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

“তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কোরবানীর জন্তুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে”। (সূরা ফাতাহ-৪৮:২৫)

- হুদায়বিয়ার যে স্থানে তারা কোরবানী করেছিলেন, সে স্থান হারামের বাইরে অবস্থিত ছিল। কেননা হারামের সমস্ত এলাকাই কোরবানীর পশু যবেহ করার জায়গা। সুতরাং জন্তুগুলো যদি হারামের এরিয়ার মধ্যে পৌঁছে যেত, তাহলে আটকিয়ে দেয়া হয়েছে- এ কথা বলা হতনা।
- হুদায়বিয়ার ঘটনা থেকে জানা গেল যে, ইহরাম বাঁধার সময় এই বলে শর্ত জড়িয়ে থাকলে فَإِنْ حَبَسْنِي حَبْسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي অর্থাৎ আমাকে কোন বাধা দানকারী বাধাগ্রস্ত করলে সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব, এমতাবস্থায় উমরার সফরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফেরত আসলে সেই উমরাহ কাযা করা জরুরী নয়। পরের বছর তিনি যেই উমরা করেছিলেন, তাকে উমরাতুল কাযা বলার কারণ হল তিনি দ্বিতীয়বার উমরাহ কাযা করার চুক্তি করেছিলেন।
- আশ্রয়ে মুতলাক তথা শর্তহীন বা সাধারণ আদেশ তাৎক্ষণিক তামীল করা জরুরী। তাই যদি না হত, তাহলে হুদায়বিয়ার দিন রসূল (ﷺ) এর আদেশ দ্রুত পালন না করার কারণে অর্থাৎ রসূল (ﷺ) এর আদেশ মোতাবেক কুরবানীর পশু যবেহ করা ও মাথা না কামানোর কারণে তিনি সাহাবীদের উপর নারাজ হতেন না। সাহাবীদের পক্ষ হতে এই আদেশ পালন করতে বিলম্ব হওয়া এবং দ্বিধা-দ্বন্ধে পতিত হওয়াকে কোনরূপ সাধুবাদ ব্যতিরেকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য জাহ্নাত আবশ্যক করেছেন।
- হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় এটি জানা গেল যে, কাফেরদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করা জায়েয আছে যে, কাফেরদের দেশ থেকে যদি কোন মুসলমান পুরুষ পালিয়ে এসে মুসলমানদের ইমামের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে তাকে কাফেরদের নিকট ফেরত দিতে হবে।

তবে কোন মহিলা মুসলমান হয়ে পালিয়ে আসলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না। কারণ মুমিন মহিলাকে কাফেরদের নিকট ফেরত দেয়া জায়েয নয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির এই অংশ অর্থাৎ নারীদেরকে ফেরত দেয়ার বিষয়টি কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। অন্য কোন অংশ মানসুখ হওয়ার দাবী করা সঠিক নয়।

- এ থেকে আরও জানা গেল, কোন মহিলা মুসলমান হয়ে যদি তার কাফের স্বামীর বিবাহ বন্ধন থেকে চলে আসে, তাহলে ঐ কাফেরকে বিবাহের সময় নির্ধারিত মোহরানা ফেরত দিতে হবে। তার বংশের এবং সমমানের মহিলাদেরকে বিবাহের সময় যেই মোহরানা প্রদান করা হয়েছে, তা আবশ্যিক নয়।
- মুসলিমদের ইমামের কাছে কাফেরদের কেউ ফেরত আসলে, তাকে কাফেরদের কাছে ফেরত দিতে হবে- এই শর্ত ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা, যে তাদের থেকে পালিয়ে এসে ইমামের কাছে না এসে অন্য কোন দেশে আশ্রয় নিল। তা ছাড়া ইমামের কাছে ফেরত আসলেও কাফেরদের থেকে ফেরত চাওয়ার তলব না আসলে ফেরত দেয়া জরুরী নয়।

- চুক্তি মোতাবেক কোন মুসলমানকে কাফেরদের দূতের হাতে ফেরত দিলে সেই মুসলিম যদি রাস্তায় সেই দূতদেরকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে কিসাস স্বরূপ ঐ মুসলমানকে হত্যা করা আবশ্যিক নয়। মুসলিমদের ইমামের উপর এর কোন দায় বর্তায়না।
- কোন মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের সাথে মুশরিকদের নিরাপত্তার চুক্তি থাকা অবস্থায় অন্য কোন এলাকার মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান এই চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের উপর হামলা করতে পারবে। মুসলিমদের উক্ত রাষ্ট্র প্রধানের উপর এই হামলা ঠেকানো জরুরী নয়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহঃ) এরকমই ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি আবু বসীরের ঘটনাকে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর আবু বসীর মক্কা থেকে পালিয়ে এসে রসূল (ﷺ) এর আয়তনের বাইরে অন্য এলাকায় চলে যায়। সেখান থেকে তিনি মক্কার কাফেরদের উপর হামলা করতেন এবং তাদের মালামাল লুট করতেন। রসূল (ﷺ) তাঁকে এ কাজ থেকে বারণ করতেন না।

ফুটনোট

[1]. পবিত্র কাবা ঘর ও মক্কা নগরীর রয়েছে সুমহান মর্যাদা। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সকল স্থানের উপর মক্কা নগরীকে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং সৃষ্টির লগ্ন থেকেই মানব জাতি কাবা ঘর ও মক্কা নগরীকে সম্মান দিয়ে আসছে। কাবা ঘর ও মক্কা নগরীর প্রতি এই সম্মান শুধু জিন-ইনসানের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং পশুপাখির হৃদয়েও আল্লাহ্ তা'আলা কাবা ঘরের প্রতি সম্মান ঢেলে দিয়েছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উটনী বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, সামনে অগ্রসর হলে এবং মক্কায় প্রবেশ করলে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে এবং কাবার সম্মান নষ্ট হতে পারে। তাই উটনী বসে গিয়েছিল। এর আগে আবরারাহর হসিযুবাহিনীও একই কারণে কাবায় প্রবেশ করা হতে বিরত ছিল।

[2] . ইবনে মাজাহ, তাও. হা/১৪০৬